মানববিদ্যা গবেষণাপত্র পঞ্চম সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪২৯ ॥ জুলাই ২০২২ ॥ ISSN 2518-5853
কলা অনুষদ ॥ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

রবীন্দ্রনাথের মৃত্তিকা-ভাবনা ও কর্মোদ্যোগ

এমডি. মাসুদ রহমান*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু কবি-শিল্পী নন, কর্মযোগীও ছিলেন। গ্রামীণ সমবায়, কৃষিকর্ম, পশুপালন, স্থাপত্য, বস্ত্র ও কুটির শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে নবতর উদ্ভাবনার সাথে নানামুখী কর্মপ্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। স্বনির্ভর গ্রামসমাজ গঠন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষা ছিল এসব কর্মযজ্ঞের প্রধান লক্ষ্য। এরই ধারাবাহিকতায় মৃত্তিকা নিয়েও ভাবনাচিন্তা করেছিলেন ও তারই আলোকে কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন। ভূমিক্ষয় হ্রাস, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, পতিত জমি ব্যবহার, জলাভূমি সংরক্ষণ, দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার্য ও শোভাবর্ধক মৃত্তিকানির্মিত সামগ্রী উদ্ভাবন, টেকসই ও শীততাপ সহনীয় মাটির ঘর তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক ও বাস্তবভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, যেগুলোর প্রায় সকটিরই কার্যকারিতা পাওয়া গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কর্মযজ্ঞের এই মূল্যবান দিকটি আজো একরকম অনালোচিতই থেকে গেছে। অনিবার্যভাবেই তাঁর মৃত্তিকাবিষয়ক পর্যবেক্ষণ ও চিন্তন সৃজনশীল সাহিত্য ও মননশীল রচনায়ও স্থান পেয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে মাটি নিয়ে কথামালা চয়ন করা হয়েছে, চিঠিপত্র থেকে এই বিষয়ে অন্তরঙ্গ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এরপর জীবনীসূত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক চিন্তা ও কর্মের বিবরণ প্রদানসাপেক্ষে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বহুধারায় বাহিত-ব্যাপ্ত রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি নবরূপ লক্ষ্যগোচর হয়েছে। দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্তিকা-ভাবনা ও কর্মোদ্যোগের মূলে ছিল মানবহিত ভাবনা ও প্রয়াস। আজকের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্যসংকট ইত্যাদি বৈশ্বিক ও দেশীয় বাস্তবতায় এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবন ও কর্মসূচি প্রয়োজনীয়, প্রাসঙ্গিক ও পরীক্ষাযোগ্য।

আমাদের বসবাসের এই গ্রহকে আমরা অনেক সময় *মাটির পৃথিবী* বলে বর্ণনা করে থাকি। মৃত্তিকানির্মিত বস্তুসামগ্রীর ভঙ্গুরতার সাথে পৃথিবীর নশ্বরতার তুলনা করে সাধারণত এরকমটি বলা হয়ে থাকে। তবে কথাটির আরো কিছু ব্যঞ্জনা আছে।

* সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী, বাংলাদেশ।

পৃথিবীর তিন ভাগ জল ছাড়িয়ে অবশিষ্ট এক ভাগ মাটির উপর মানুষের বসবাস। ভারতীয় দর্শন মতে সৃষ্টি জগতের তিন থেকে পাঁচটি উপাদানের একটি মাটি। কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে প্রথম মানবের সৃষ্টি মাটি থেকে; বিজ্ঞানও বলে মাটির মধ্যে থাকা অনেক উপাদান মানবদেহেও লভ্য এবং শেষত সৎকারের পর মানবদেহ মাটিতেই বিলীন হয়। কঠিন মৃত্তিকাঘেরা পাহাড়ের গুহায় যে মানবজাতি প্রথম বাসস্থান নির্মাণ করেছিল, আজ আধুনিক যুগেও সেই মাটির উপরই তার স্থাপনা। জীবনযাপনে মৃত্তিকাজাত বস্তুসামগ্রীর উপাদানও কম নয়। মাটির সাথে মানুষের এই বহুমাত্রিক সম্পর্ক সুগভীরভাবে কবিশিল্পীর চেতনায় ও শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে ক্রিয়াশীল থাকে।

রবীন্দ্র-অনুভবে মাটি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-শিল্পী। বলা হয়ে থাকে যে, জগৎ-জীবনের প্রায় সকল আবেগ-অনুভূতি তাঁর হৃদয়ে অনুভূত-উপলব্ধ হয়ে শিল্পের প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ হয়েছে। যথারীতি তাঁর মুগ্ধদৃষ্টি ও গভীর অনুভবের উৎস হয়েছে মাটি। নিজেই বলেছেন, *চিরদিন মাটি আমাকে ডেকেছে* (ঠাকুর ১৩৫১ক: ৯৮), তাই *শেষ বেলাকার ঘরখানি* (পৃ. ৯৭) বানিয়েছিলেন মাটির। "শ্যামলী" নামের সেই ঘরখানির কথায় আমরা আসবো আলোচনার শেষে; তার আগে দেখে নিতে চাই মাটি নিয়ে তাঁর ভাবনা ও কর্মোদ্যোগ ছিল কী বিচিত্র, কতোটা বৈজ্ঞানিক ও কীরূপ তাৎপর্যবহ।

দেবতার গ্রাস কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মানবজাতির আশ্রয় মাটি তথা পৃথিবীর বাহ্যিক ভূমিকার সাথে মর্মের যোগ ঘটিয়ে বলেছেন:

> হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
> অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
> সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
> শ্যামলকোমলা, যেথা যে কেহই থাকে
> অদৃশ্য দু-বাহু মেলি টানিছ তাহাকে
> অহরহ অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে
> দিগন্তবিস্তৃত তব শান্ত বক্ষপানে। (ঠাকুর ১৩৬০ক: ১০৪)

বসুন্ধরা কবিতায়ও এমনই সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে মাটি ও পৃথিবী:

> ওগো মা মৃন্ময়ী,
> তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;
> দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
> বসন্তের আনন্দের মতো; (ঠাকুর ১৩৫১খ: ১৩১)

মাটি বা মৃত্তিকা পৃথিবীর সমার্থক হয়ে তাঁর অনেক লেখায় ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন, *রামমোহন রায়* শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন: *এই পৃথিবী এই মৃত্তিকা*। (ঠাকুর ১৪১৩: ৩৫৬) এই বলাটা যে সত্যিই যথার্থ তা বোঝাতেই যেন দেবতাদের অনুষঙ্গ করেছেন একটি নাটিকায়। *স্বর্গমর্ত্য* নামক নাটিকার সেই অংশটি উদ্ধার করা যাক:

ইন্দ্র। যে মাটির থেকে রস টেনে স্বর্গ আপনার ফুল ফুটিয়েছিল সেই মাটির সঙ্গে
তার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে।
বৃহস্পতি। মাটি আপনি কাকে বলছেন?
ইন্দ্র। পৃথিবীকে। (ঠাকুর ১৩৬৫ক: ১৭৩)

মাটি কবিতায় *বাখারীর-বেড়া-দেওয়া* ভূমিতে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর মনে আসে মাটিতে শালতরুসারি *শিকড়ের গভীর বিস্তারের* সাহায্যে বাসযোগ্য করে তোলে। ভারতভূখণ্ডও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে কালে-কালে, যুগ-যুগান্তে কতো আর্য-অনার্য এসেছে, তাদের "এ মাটি নিয়েছে ঘেরি— ।" শেষত—

মাটির পাত্রের মতো প্রতি ক্ষণে ভরেছিল যারা
এ ভূমিতে,
এরে তারা পারিল না কোনো চিহ্ন দিতে। (ঠাকুর ১৩৬৩: ৮৯)

অর্থাৎ সবশেষে মাটিই সত্য হয়ে থাকে।

চিহ্ন না থাকুক, জীবন ও জীবনাবসানে মাটিই যেহেতু ঠাঁই দেয়, তাই রবীন্দ্রনাথকে বলতেই হয়: "ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা" (ঠাকুর ১৪০১: ২৪৪)। যারা এই মাটিকে ভুলে যায়, তাদের প্রতি আহ্বান রাখেন: "ফিরে চল্ মাটির টানে" (ঠাকুর, ১৪০১: ৬১২)। কারণ *চণ্ডালিকার* প্রকৃতি-কন্যার ভাষায় বলা চলে: "এই মাটি তোর আপন" (ঠাকুর, ১৪০১: ৭২৩)। "ফুল বলে. ধন্য আমি ধন্য আমি মাটির 'পরে" (ঠাকুর, ১৪০১: ৭১৫); আর মানুষ বলে "আমি তোমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা" (ঠাকুর, ১৪০১: ৫৮৭)। প্রসঙ্গত, শেষ তিন উক্তিই *চণ্ডালিকা* গীতিনাট্যের অংশবিশেষ, যেখানে মাটি ও জলের সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তার কথাও ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছিল।

অবশ্য সবাই সবসময় যে মাটির প্রতি প্রীতিপরবশ বা দায়িত্বশীল থাকে এমন নয়। তবে মাটির প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় স্বদেশদ্বেষী; *কণিকার* "স্বদেশদ্বেষী" কবিতায় কল্পনা করেছেন কবি:

কেঁচো কয়, 'নীচ মাটি, কালো তোর রূপ।'
কবি তারে রাগ ক'রে বলে, 'চুপ! চুপ!
তুমি যে মাটির কীট, খাও তারি রস—
মাটির নিন্দায় বাড়ে তোমারি কি যশ। (ঠাকুর ১৩৭১: ২০)

কিন্তু এ আসলে কেঁচোর কথা নয়, মানুষেরই কথা—মূলত মাটি নিয়ে নয়, মানুষের অকৃতজ্ঞ-কৃতঘ্ন প্রবল স্বভাবদোষের কথাই এখানে ব্যঞ্জিত হয়েছে। মাটিকে কেন্দ্র করে মানুষও এইরকম আত্মঘাতী-অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। তবে আমাদের এই উদ্ধৃতি চয়নের উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনায় মাটির বিচিত্র ধরনের অনুষঙ্গ হওয়ার ধারণা দেওয়া। এখানে আরও কয়েকটি রবীন্দ্র-বাণী স্মরণ করা যেতে পারে, যেসব স্থানে ভিন্ন প্রসঙ্গে বক্তব্য স্পষ্ট করতে গিয়ে মাটি সম্পর্কিত তুলনা-উপমা প্রয়োগ করেছেন। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* বইয়ের *ভাষার কথা* অধ্যায়ে কোনো একটি ভাষা যদি অপর

ভাষা বা ব্যাকরণের দ্বারা অধিক শাসিত হয়, তবে সে ভাষার ভাবপ্রকাশ ক্ষমতা বা বোধগম্যতা যে কঠিন হয়ে পড়ে—এই বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে লেখেন: "যেখানে মাটি কড়া সেখানেই ফসলের দুর্দিন।" (ঠাকুর ১৩৯১: ৬); "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" প্রবন্ধে ইউরোপীয় ভাবধারা ও সমাজে তার সমন্বয় করার অসুবিধা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "ইংরেজি সাহিত্য পেতে পারি কিন্তু ইংলণ্ড পাব কোথা থেকে। বীজ পাওয়া যায় কিন্তু মাটি পাওয়াই কঠিন।" (ঠাকুর ১৩৬৭: ২৪৬)

এমনিভাবে আক্ষরিক ও আলংকারিক উভয়ত রবীন্দ্রনাথ মাটি নিয়ে কথা বলেছেন নানা প্রসঙ্গে ও প্রসঙ্গক্রমে। সবমিলিয়ে বোঝা যায়, মাটি সম্পর্কে তাঁর পড়াশোনা ও বোঝাপড়াটা ছিল নানা দৃষ্টিকোণ ও মাত্রায়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে সৌন্দর্য উপভোগ, মর্ত্যপ্রীতি থেকে পরিবেশ রক্ষা, ভাষিক চারুশিল্পের অনুষঙ্গ থেকে ব্যবহারিক কারুশিল্পের উন্নয়ন ইত্যাদি ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মৃত্তিকা সংলগ্ন ভাবনা ও কর্মোদ্যোগ সমৃদ্ধ ও মহৎ হয়ে উঠেছে।

মাটি নিয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবনা

বর্তমান আলোচনায় আমরা রবীন্দ্রনাথের মাটির ব্যবহারিক-বৈজ্ঞানিক ভাবনা জানতে প্রয়াসী। লেখালেখি বিষয়ে জ্ঞাতব্য, ঠাকুরবাড়ি থেকে যেসব পত্রিকা বের হতো তাতে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধও স্থান পেতো। এসব প্রবন্ধের মধ্যে মাটি-ভূগর্ভ নিয়েও আলোচনা থাকতো। যেমন, ১২৮৭ সালে *ভারতী* পত্রিকায় ছিল *পৃথিবীর উৎপত্তি*, *ভূগর্ভ*, *ভূকম্পন* ইত্যাদি। এসব রচনায় সবসময় লেখকের নাম থাকতো না। তাই কোনটি বা কতোটি রবীন্দ্রনাথের রচনা সেটি নিশ্চিত করে বলা না গেলেও এটুকু বোঝা যায় মৃত্তিকা নিয়ে ভাবনা বা পঠন-পাঠনের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবে *সাধনার* ১৩০১ সালে আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত *ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ* শীর্ষক রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষরিত প্রবন্ধটি তো বিখ্যাত। শুধু মৃত্তিকাবিষয়ক লেখালেখি নয়, এ নিয়ে অন্যের লেখার আলোচনাও করেছেন। ১৯২২ সালের ২৮ জুলাই রবীন্দ্র-সুহৃদ লেনার্ড নাইট এলমহার্স্ট বিশ্বভারতী সম্মিলনীর ব্যবস্থাপনায় কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরির এক সভায় "The Robbery of Soil" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। প্রবন্ধটিতে এলমহার্স্ট বলেছিলেন:

> বিশেষ অঞ্চলের মাটি সেই অঞ্চলের ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। তাই মাটির চরিত্র কৃষিসহ সব কিছু মিলিয়ে দেখা দরকার। ...নানা কারণে মাটির প্রকৃতি পাল্টে গেলেও ঐ অঞ্চলের পুরনো ইতিহাস ঐ মাটিতে এক সময়ের বসবাসকারী মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের পরিচয় ধরে রাখে। (হাজরা ২০১২: ৪৬০)

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সান্ধ্যকালীন সে সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রবন্ধকারের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন এবং মাটির উপর ডাকাতি নয় বরং তার ঋণশোধ করার জন্যে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

সৃষ্টিতত্ত্ব

মৃত্তিকার সৃষ্টি মানে পৃথিবীর সৃষ্টি। পৃথিবীকে পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই বলা হয়ে আসছে সসাগরা পৃথিবী। তবে—*আত্মপরিচয়* গ্রন্থে—রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য পৃথিবীকে "যাহারা জলরেখাবলয়িত; মাটির গোলা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহার যেন মনে করে যে, জলকে জল বলিলেই সমস্ত জল বোঝা গেল এবং মাটিকে মাটি বলিলেই সে মাটি হইয়া যায়!" (ঠাকুর, ১৩৮১ক: ২০০)। *বিশ্বপরিচয়* গ্রন্থের "পরমাণুলোক" প্রবন্ধে তিনি যথার্থ বর্ণনা করে বলেছেন: "জলে মাটিতে তৈরী এই পিণ্ডটি, এই পৃথিবী।" (ঠাকুর ১৩৬৫খ: ৩৫৪)। *ভারতী* পত্রিকায় (বৈশাখ ১২৮৫) "সামুদ্রিক জীব" প্রবন্ধে এ সত্যর উল্লেখ করেছেন: "পৃথিবীতে জলই নিয়ম-স্বরূপ, শুষ্কভূমি তাহার ব্যতিক্রম মাত্র" (ঠাকুর, ১৪১০: ৪৯৭)। পূর্ববঙ্গে যেখানে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় জন্ম, সেখানে মৃত্তিকার নির্মাণ তথা পৃথিবীর জন্ম বিষয়ে ব্যবহারিক পাঠ লাভ করেন। ১৪ জানুয়ারি ১৮৯১ তারিখে সাজাদপুর হতে জলপথে ভেসে যেতে যেতে চারদিকে জলের মাঝে সবুজ ঘাস আচ্ছাদিত সামান্য স্থলভূমি দেখলেন। "দেখে পৃথিবীর শিশুকাল মনে পড়ে—অসীম জলরাশির মধ্যে যখন স্থল সবে একটুখানি মাথা তুলেছে।" (ঠাকুর, ১৪১১: ৩৫); ৯ ডিসেম্বর ১৮৯২ ছিলেন শিলাইদহে। কিছুদিনের অসুস্থতার কারণে শরীর কিছুটা দুর্বল। তবে বোটের জানালায় বসে প্রিয় পদ্মাকে দেখতে দেখতে কল্পনা শক্তি প্রবল হলো। লিখলেন:

> আমি বেশ মনে করতে পারি বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। (ঠাকুর ১৪১১: ১১৫)

কলকাতায় বসে কিন্তু তাঁর চঞ্চল হৃদয়ে স্মরণে আসে আরো আগের কথা, "পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একেবারে একলা ছিল।" (ঠাকুর ১৪১১: ১৪২)

পৃথিবী সৃষ্টির এই তত্ত্ব-তথ্য শুধু কাব্য-কথায় নয়, একেবারে বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয়বস্তুও করেছেন। *বিশ্বপরিচয়*-এর "ভূলোক" প্রবন্ধে:

> পৃথিবীর উপরকার স্তরে কোনো ঢাকা না থাকাতে সেই ভাগটা শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হল, আর ভিতরের স্তর ক্রমশ নিরেট হতে থাকল। দুধের সর ঠাণ্ডা হতে হতে যেমন কুঁচকিয়ে যায়, পৃথিবীর উপরকার স্তর ঠাণ্ডা হতে হতে তেমনি কুঁচকিয়ে যেতে লাগল। কুঁচকিয়ে দুধের সর যেমন অসমান হয় সে আমরা গণ্যই করি নে। কিন্তু কুঁচকিয়ে-যাওয়া পৃথিবীর স্তরের অসমানতা তেমন সামান্য ব'লে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। নিচের স্তর এই অসমানতার ভার বইবার মতো পাকা হয় নি। তাই ভালো নির্ভর না পাওয়াতে উপরের শক্ত স্তরটা তুবড়ে উঁচুনিচু হতে থাকল, দেখা দিল পাহাড়পর্বত। বুড়ো মানুষের কপালের চামড়া কুঁচকে যেমন বলি পড়ে, তেমনি এগুলো যেন পৃথিবীর উপরকার চামড়ার বলি। সমস্ত পৃথিবীর বৃহৎ গভীরতার তুলনায় এই পাহাড়পর্বত মানুষের চামড়ার উপর বলিচিহ্নের চেয়ে কম বই বেশি নয়। (ঠাকুর ১৩৬৫খ: ৪০৪)

আবার মাটির রূপ-রূপান্তরের বৈজ্ঞানিক বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ কাব্যভাষায়ও বিবৃত করেছেন। যেমন, *প্রভাতসংগীত*-এর *অনন্ত জীবন* কবিতায় বলছেন:

> এ জগতে কিছুই মরে না।
> নদীস্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা,
> ভেসে আসে, সাগরে মিশায়,
> জান না কোথায় তারা যায়!
> একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর
> রচিছে বিশাল মহাদেশ,
> না জানি কবে তা হবে শেষ। (ঠাকুর ১৩৫৬: ৬৫)

পানির সাথে মিশে মিশে এসে যে কণারাশি মৃত্তিকাপৃষ্ঠ গড়ে তোলে সেই মাটির সঙ্গে পানির বৈচিত্র্যপূর্ণ গাঠনিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী সম্পর্ক রয়েই যায়। সেসবের কথাই রবীন্দ্রনাথ স্বল্প পরিসরে বোধগম্য করে আলোচনা করেছিলেন "ভূগর্ভস্থ জল ও বায়ুপ্রবাহ" শীর্ষক প্রবন্ধে—আমরা আগেই বলেছি, প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের মৃত্তিকাবিষয়ক গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। মাটি কঠিন হলে পানি ভিতরে প্রবেশ করতে না পেরে চারপাশে জলধারা রূপে প্রবাহিত হয়। ছিদ্রযুক্ত মাটির অভ্যন্তরে জল প্রবেশ করে। মৃত্তিকা অভ্যন্তরে আবার শক্ত মাটির স্তর পেলে সেখানে অন্তঃসলিলা ধারার সৃষ্টি হয়। মাটির ছিদ্রে সাধারণত বায়ু থাকে। অধিক পানি এসে সেই ছিদ্রযুক্ত স্থান দখল করে নেয়। মাটির নিচের এই জলস্তর ভূপৃষ্ঠ হতে কাছাকাছি হলে কুয়া-পুকুরে সামান্যতেই পানি মেলে। সমস্যা হচ্ছে বর্ষাকালে এই স্তর ভূপৃষ্ঠের আরো নিকটবর্তী হয়। কারো মতে, কখনো কখনো ভূমির আর্দ্রতা রোগজীবাণুর পরিপোষক। তাছাড়া এরকম স্থানে সহজেই আবর্জনা-মল-মূত্র তার সাথে মিশে যায়, পুরো পানিকে বিষাক্ত করে। তাই তো এসময় রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। আবার জলাশয়ে ময়লা আবর্জনা ফেললে পানি দূষিত হয় বটে, তবে ভূগর্ভস্থ জল যদি ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী হয়, সেক্ষেত্রে সরাসরি জলাশয়ে আবর্জনা না ফেলে মাটির উপরও যদি যত্রতত্র থাকে তাহলেও পানি দূষিত হয়ে পড়ে। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ ঘরবাড়ির মেঝে শক্ত করা বা আঙিনা শক্ত মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন:

> ...এই প্রবন্ধ পাঠ হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুর উপর আমাদের স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। যাহাতে জলাশয়ের নিকটবর্তী কোনো স্থানে দূষিত পদার্থ না জমিতে পারে সেজন্য সতর্ক হওয়া উচিত। এবং ঘরের মেঝে ও বাড়ির চারি দিকে কিছুদূর পর্যন্ত ভালো করিয়া বাঁধাইয়া দিয়া ভূগর্ভস্থ দূষিত বাষ্পমিশ্রিত বায়ুর পথ রোধ করা বিশেষ আবশ্যক। (ঠাকুর ১৪১০: ৫২৫)

বৃক্ষ-বনানী প্রসঙ্গ

তর্কসাপেক্ষ ধারণা এই যে, থিয়া নামক গ্রহাণুর আঘাতে সৃষ্ট পৃথিবী নামক গ্রহটি ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রমের কালে সূর্যের আকর্ষণে এবং কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগ শক্তির

টানাটানিতে সৌরজগতের মাঝামাঝি মানে তৃতীয় কক্ষবলয়ে ঘূর্ণমান হয়। সংঘর্ষের কারণে তীব্র তপ্ত হয়ে পৃথিবী হয়ে পড়ে লাভার সমুদ্র। দীর্ঘদিন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে তাপশৈত্যের বিক্রিয়ায় তপ্ত জলরাশি ঠাণ্ডা হতে থাকে; সেই বিপুল পরিমাণ জলই সাগর-মহাসাগর। ঠাণ্ডার কারণে সেই জলের শৈত্যে লাভারাশি জমাট বেঁধে পর্বত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। আবার তিনগুণ জলের মাঝে কঠিন-কোমল ভূখণ্ড মিলে সবুজ-শ্যামল-সরস-প্রাণময় হয়ে ওঠে আমাদের গ্রহটির অবশিষ্ট অংশ। সেই সৃষ্টিক্ষণটি রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন মানুষের বিশেষত মেহনতি মানুষের শস্যসৃষ্টির কর্ম-প্রক্রিয়ায়— শ্রীনিকেতনের হলকর্ষণ-উৎসবের বাণীতে বলেন:

> পৃথিবী একদিন যখন সমুদ্র স্নানের পর জীবধাত্রীরূপ ধারণ করলেন তখন তাঁর প্রথম যে প্রাণের আতিথ্যক্ষেত্র সে ছিল অরণ্যে। তাই মানুষের আদিম জীবনযাত্রা ছিল অরণ্যচররূপে। পুরাণে আমরা দেখতে পাই, এখন যে-সকল দেশ মরুভূমির মতো, প্রখর গ্রীষ্মের তাপে উত্তপ্ত, সেখানে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত দণ্ডক নৈমিষ খাণ্ডব ইত্যাদি বড়ো বড়ো সুনিবিড় অরণ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। (ঠাকুর ১৩৮১ক: ৫৫৮)

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে উদ্ভিদ যেন মাটির সন্তান—একবারে সুসন্তান যাকে বলে। *বৃক্ষবন্দনা* কবিতায় তাই বলেছেন:

> মৃত্তিকার হে বীর সন্তান
> সংগ্রামে ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
> মরুর দারুণ দুর্গ হতে; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে;
> সন্তরি সমুদ্র-ঊর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
> শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায় (ঠাকুর ১৩৭০: ১১৬)

সাধারণের ধারণা মাটিই শুধু গাছকে ধরে রাখে। একথা সত্য যে, গাছের প্রথম-প্রধান আশ্রয় মাটিই বটে, তবে গাছও মাটিকে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে বা শক্ত হয়ে সংলগ্ন রাখতে সাহায্য করে। সিমেন্ট-বালি-কাঁকরকে যেমন আটকে রাখে রড, তেমনি বিশেষত পাহাড়ি অঞ্চলে ধূলিকণাসমূহ আটকে রেখে মৃত্তিকাকে ভূমি হয়ে থাকতে সাহায্য করে বৃক্ষ। সমুদ্রকিনারেও একই ঘটনা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "...গাছের শিকড় যে মাটিকে বেঁধে রাখে নি বৃষ্টির আঘাতে সে মাটি কতদিন টিকতে পারে।" (ঠাকুর ১৩৭৮ক: ৪৫৩)

তবে এই উদ্ভিদের জন্ম, অরণ্যের সৃষ্টি প্রথমত প্রাকৃতিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হলেও মানুষের কারণেই তার অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হয়ে পড়েছে। মানুষ মৌলিক চাহিদা মেটাতে, নিজেকে অস্তিত্বশীল রাখতে মাটিনির্ভর হলেও সেই মাটির প্রতি তার দরদ-দায়িত্ববোধ সবসময় দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এই আত্মঘাতী ভূমিকা থেকে মানুষকে সরে আসার জন্যে সচেতন করতে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসবে বলেছেন:

> মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে; প্রকৃতির সহজ দানে কুলোয় নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই-যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে—এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য—সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে—আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তার ফল, দিন তার ছায়া। (ঠাকুর ১৩৮১ক: ৫৪৬)

তাঁর এই বক্তব্য আজকের দিনেও নির্মমভাবেই প্রাসঙ্গিক।

মাটিরক্ষা ও কৃষিকর্ম

উদ্ভিদ-বৃক্ষাদি সরাসরি আমাদের ফল-ফসল দিয়েই তাদের কাজ শেষ করে না, মাটিকেও যে সে ধরে রাখে, ফসলপ্রসূ করে, সেসব তত্ত্ব-তথ্য আমরা ইতঃপূর্বে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় জেনেছি। সেই সঙ্গে মানুষের দ্বারা মাটিকে বিপন্ন করার, এবং তার ফলে মানুষ নিজেও যে বিপদাপন্ন হচ্ছে সে খবরও পেয়েছি। বিশ্বজুড়েই বিধ্বংসী-বিনাশী এই কর্মটি চলছিল। *পল্লীপ্রকৃতির অরণ্যদেবতা* অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বের চিত্র তুলে ধরে বলেছেন যে, একদিকে "আমেরিকাতে বড়ো বড়ো বন ধ্বংস করা হয়েছে", আবার "ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই—যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে"—তাঁর ভাষায়:

> লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতি ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করেছে। (ঠাকুর ১৩৮১ক: ৫৪৬-৪৭)

ক্রমবর্ধমান এই ক্ষতির কারণেই আশঙ্কা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে লিখেছিলেন যে, তিনি আকাশ-সমুদ্রের শূন্যতাকে মেনে নিতে পারেন, কিন্তু "ভূমির শূন্যতাকে সবচেয়ে বেশি শূন্য মনে হয়।" (ঠাকুর ১৪১১: ২৬৭) কারণ সর্বত অর্থে জীবনধারণ করা ও জীবনধারার প্রবাহমানতার জন্যে মাটিরই প্রয়োজন। *পূরবীর* "৩" সংখ্যক কবিতায় বলেছেন:

> আজকে খবর পেলেম খাটি—
> মা আমার এই শ্যামল মাটি,
> অন্নে ভরা শোভার নিকেতন; (ঠাকুর ১৩৬০খ: ৭)

পূরবীর এই "মাটির ডাক" কবিতা লেখার দিনেই (২৩ মাঘ ১৩২৮) লিখেছিলেন: *ফিরে চল মাটির টানে* গানটি। তবে সব মাটিতেই তো অন্ন মেলে না, নিকেতনও গড়া যায় না। এখানে আমরা কৃষি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার কথা বলতে চাচ্ছি। সব মাটিতে সব ফসলও ফলে না। কিন্তু জনপদ সংলগ্ন মাটিতে কিছু না কিছু ফলানো যায় সেই দিকটিও লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। "বুধু" কবিতাটির নিম্নোক্ত অংশটি স্মরণ করা যেতে পারে:

মাঠের শেষে গ্রাম,
সাতপুরিয়া নাম।
চাষের তেমন সুবিধা নেই কৃপণ মাটির গুণে,
পঁয়ত্রিশ ঘর তাঁতির বসত, ব্যবসা জাজিম বুনে।
নদীর ধারে খুঁড়ে খুঁড়ে পলির মাটি খুঁজে
গৃহস্থেরা ফসল করে কাঁকুড়ে তরমুজে (ঠাকুর ১৩৭৮খ: ৭৬)

মাটির এই কৃপণ গুণের কারণও তিনি সম্যকভাবে জানেন। সাতপুরিয়া গ্রামটি নদীর ধারে, কাজেই স্বাভাবিক মাটির পরিবর্তে বালিই বেশি। মরুভূমি বালুকাময়; সেখানে বালিকণা যেমন পরস্পর বিশ্লিষ্ট, গাছপালাও বিরল ও বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত। *ভারতপথিক রামমোহন* গ্রন্থে জাতির উন্নতির জন্যে ঐক্যের অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে তুলনামূলক যুক্তি দিয়ে বলেছেন:

> মরুভূমিতে দেখা যায় উদ্ভিদ দূরে দূরে বিশ্লিষ্ট, তার কাঁটার দ্বারা নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে রক্ষা করেছে। তাদের জননী এক রসের দাক্ষিণ্যে সকলকে পরিপোষণ করে নি, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রাণের ঐক্যে কার্পণ্য। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, মাটির কণায় কণায় বন্ধন আছে, বালির কণায় কণায় বিচ্ছেদ। (ঠাকুর ১৩৭৯: ১৫)

আর অরণ্যে কিংবা জনপদে গাছপালা যে বেশি থাকে তা মাটির কারণে, আবার মাটি উর্বরা হয় গাছপালার কারণে—একে অন্যের পরিপূরক। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে "প্রীতিভাজনেষু" সম্বোধনে করা *বিশ্বপরিচয়* গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লিখেছেন: "বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা।" (ঠাকুর ১৩৬৫ক: ৩৪৮) আবার এক অভিভাষণে পূর্বসূরি সাহিত্যিক হিসেবে নিজের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করেছেন উদ্ভিদের মাটির সাথে বিলীন হওয়ার সার্থকতা দিয়ে। *সাহিত্যের পথে*-এ গ্রন্থে "কবির অভিভাষণ"-এ বলেছেন: "মেয়াদ ফুরোলে যে-গাছ মরে যায় অনেক দিন থেকে ঝরা পাতায় সে মাটি তৈরী করে; সেই মাটিতে খাদ্য জমে থাকে পরবর্তী গাছের জন্যে।" (ঠাকুর ১৯৫৮: ৪৯১)

দেখা যাচ্ছে, মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির বিষয়ে তিনি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতেই জোর দিয়েছেন। আমাদের এই ধারণার সপক্ষে তাঁর আরেকটি বক্তব্য স্মরণ করতে পারি। *বিশ্বভারতী* গ্রন্থের "৭" নম্বর প্রবন্ধে লিখেছেন:

> যদি কেবল উপরিতলের মাটি উর্বরা হয় তবে বনস্পতি দ্রুত বেড়ে ওঠে; কিন্তু অবশেষে তার শিকড় নীরস তলায় গিয়ে *ঠেকে*, তখন হঠাৎ একদিন তার ডালপালা মুষড়ে যেতে আরম্ভ করে। (ঠাকুর ১৩৮১ক: ৩৭৪);

কথাটি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন শান্তিনিকেতনের একটি অনুষ্ঠানে শিক্ষার উদারতা, সভ্যতার গভীরতা বোঝাতে। কিন্তু বীরভূমসহ বাংলার মাটির উপরিতলা তো তখন প্রয়োজনীয় উর্বরা ছিল না এবং ক্রমান্বয়ে সরসতা হারাচ্ছিল। সেটা দেখে তিনি বলেছেন—(*পল্লীপ্রকৃতি*):

> সমস্ত দেশের ধূসর মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে বলছে, 'তোমাদের ঐ যা-কিছু ভাবের সমারোহ, ঐ যা-কিছু জ্ঞানের সঞ্চয়, ও তো আমারই জন্যে—আমাকে দাও, আমাকে দাও। সমস্ত নেবার জন্যে আমাকে প্রস্তুত করো। আমাকে যা দেবে তার শতগুণ ফল পাবে।' (ঠাকুর ১৩৮১ক: ৫১৯)

গ্রামের কৃষকেরা মাটির উর্বরা শক্তি একান্তই প্রকৃতির দান বলে মনে করে। অশিক্ষিত চাষীদের পক্ষে এ ভাবনা হয়তো খুব একটা দোষের নয়, কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত মানুষের কিছু করণীয় আছে। কারণ মাটিতে প্রয়োজন মতো ফসল ফলাতে না পারলে সব মানুষের জন্যেই খাদ্যাভাব, অসুস্থতার মতো দুর্যোগ দেখা দেবে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ "এই মাটির উপর মন এবং বুদ্ধি খরচ" করার আহ্বান জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের কী লক্ষ্য হওয়া উচিত তা নিয়ে কথা বলেছেন:

> আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়—সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে, তাহার সংযোগ হওয়া চাই। (ঠাকুর ১৩৮১ক: ৫২৬)

কথাগুলো প্রথমে তিনি বলেছিলেন আশ্বিন ১৩২৫ বঙ্গাব্দে বীরভূম জেলা হতে *ভূমিলক্ষ্মী* নামক একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ উপলক্ষে। এর কয়েকবছর পর ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর অধিবেশনে তিনি মাটির দারিদ্র্যবৃদ্ধি বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন:

> সংসারটা একটা চক্রের মতো। আমাদের জীবনের, আমাদের সংসারের গতি চক্রপথে চলে। মাটি থেকে যে প্রাণের উৎস উৎসারিত হচ্ছে তা যদি চক্রপথে মাটিতে না ফেরে তবে তাতে প্রাণকে আঘাত করা হয়। পৃথিবীর নদী বা সমুদ্র থেকে জল বাষ্পাকারে উপরে উঠে, তার পর আকাশে তা মেঘের আকার ধারণ করে বৃষ্টিরূপে আবার নীচে নেমে আসে। যদি প্রকৃতির এই জলবাতাসের গতি বাধা পায় তবে চক্র সম্পূর্ণ হয় না, আর অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উৎপাত এসে জোটে। মাটিতে ফসল ফলানো সম্বন্ধে এই চক্ররেখা পূর্ণ হচ্ছে না বলে আমদের চাষের মাটির দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে, কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি যে কতদিন থেকে চলছে তা আমরা জানি না। (ঠাকুর, ১৩৮১ক: ৫৬৪)

রবীন্দ্রনাথের মতে গাছপালা, জীবজন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যা পায় তা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্তনকে সম্পূর্ণতা দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একমাত্র মানুষই তা করছে না। সে মাটি পুড়িয়ে ইট, গাছ কেটে কাঠ এমনিভাবে নানা জিনিস তৈরী করে চলেছে যা শেষ পর্যন্ত তার সাথে মাটির বা প্রকৃতির "প্রকাণ্ড ব্যবধান" তৈরী করেছে। এসব প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য:

> এই-সকল আয়োজন উপকরণ অনিবার্য সে কথা মানি; তবুও এ কথা তাকে ভুললে চলবে না যে, মাটির প্রাণ থেকে যে তার প্রাণময় সত্তার উদ্‌ভব হয়েছে, গোড়াকার এই সত্যকে লঙ্ঘন করলে সে দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে না। মানুষ প্রাণের উপকরণ যদি মাটিকে ফিরিয়ে দেয় তবেই মাটির সঙ্গে তার প্রাণের কারবার ঠিকমত চলে, তাকে ফাঁকি দিতে গেলেই নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হয়। মাটির খাতায় দীর্ঘকাল কেবল খরচের অঙ্কই দেখি আর জমার বড়ো—একটা দেখতে পাই নে তখন বুঝতে পারি দেউলে হতে আর বড়ো বাকি নেই। (ঠাকুর ১৩৮১: ৫৬৫)

কারু ও চারু শিল্প

> সমালোচকের এই বক্তব্য সত্য:
> রবীন্দ্রনাথের কৃষি ভাবনায় যে বিজ্ঞানমনস্কতা দেখি, তাতে মাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তিনি জমিদারি অঞ্চলে ঘুরে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মাটি দেখেছেন। সেখানে কোনোটা চাষের উপযোগী তো, অন্যত্র আদৌ চাষযোগ্য নয়। (হাজরা ২০১২: ৪৬০)

চাষের উপযোগী সব জমিতে আবার সব ফসল ফলে না। কোনটি বা অধিক ফলে। আরও নতুন কী ফসল ফলানো যায় সে সম্পর্কে তিনি ভেবেছেন—বাংলাদেশে বেশকিছু নতুন ফল-ফসল চাষের তিনিই প্রবর্তক। তাঁর কৃষিবিষয়ক ভাবনা ও কর্মোদ্যোগের কথা এখন অনেকটাই বিশ্রুত। চাষবাসের বাইরেও মাটিকে নানাভাবে ব্যবহারের জন্যে তিনি শিলাইদহে মাটি নিয়ে গবেষণার জন্য একটা ছোটোখাটো গবেষণাগার গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনেও এই গবেষণা অব্যাহত থাকে। এর ফলে নানা ধরনের চারু-কারুশিল্পের উদ্ভব ও উন্নয়ন তাঁর দ্বারা সাধিত হয়েছে।

সেকালে হাট ছিল গ্রামীণ অর্থনীতির কেন্দ্র। সব গ্রামে বা পাড়াগাঁয়ে সাধারণত কাছাকাছি দূরত্বে বাজার-বিপণী ছিল না। তবে গ্রামে গ্রামে সাপ্তাহিক-অর্ধসাপ্তাহিক ভিত্তিতে হাট বসতো। দৈনন্দিন খাদ্যশস্য থেকে শুরু করে সংসার ও বৃত্তীয় কর্মের যাবতীয় জিনিস বেচাকেনা হাটেই চলতো। রবীন্দ্রনাথ এই হাটের ছবি আঁকতে গিয়ে প্রথমেই দেখিয়েছেন মাটির সামগ্রী। যথা: "হাট" কবিতায়—

> কুমোর পাড়ার গোরুর গাড়ি—
> বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি। (ঠাকুর ১৩৯৮: ২৮)

নাটোরের দিঘাপাতিয়া দিয়ে বোটে চড়ে আশ্বিনের শুরুতে অর্থাৎ জল যখন নামেনি "ডাঙাপথ একেবারেই নেই" এমন অঞ্চলে "বড়ো বড়ো গোল মাটির গামলা"কে নৌকার মতো ব্যবহার করতে দেখেছেন সঙ্গে "একখণ্ড বাখারিকে দাঁড়ের মতো ব্যবহার করে লোকেরা।" (ঠাকুর, ১৪১১: ২৩২) গ্রামসমাজে মাটির সামগ্রীর এমনই নানারূপ ব্যবহার দেখে কুষ্টিয়ার শিলাইদহের অদূরে লাহিড়ীপাড়ায় রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ পল্লী গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাতে কুমোরদের জন্যেও আলাদা প্লট রেখেছিলেন। পূর্ববঙ্গে এসব কর্মসূচী পরিচালনার একটি চিত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথকে পতিসর থেকে (নভেম্বর ১৯১৫ খ্রি.) লেখা চিঠিতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে:

> ...এখানে চাষাদের কোন্ Industry শেখানো যেতে পারে ভাবছিলাম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না—এখানে থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিসটাকে Cottage Industry রূপে গণ্য করা যায় কিনা। একবার খবর নিয়ে দেখিস্—অর্থাৎ ছোটখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কি না। মুসলমানরা যে রকম সান্‌কির জিনিস ব্যবহার করে এরা যদি সেইরকম মোটাগোছের প্লেট বাটি প্রভৃতি তৈরী করতে পারে তাহলে উপকার হয়। (ঠাকুর ২০১২: ৪৯)

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রা ক্লাবের পক্ষ থেকে একজন উৎসাহী যুবক নিয়োগ করা হয়েছিল, "গ্রামে গ্রামে ঘুরে আলপনা, ছুঁচের ফোঁড়ের রকমারি কাজ, মাটির বাসন, বাঁশ ও বেতের ভালো ভালো কাজের নমুনা সংগ্রহ করার জন্য।" (ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ১৩৯৫: ১১৩) কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী, ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ-বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আত্মীয়-পরিজন এবং কালীমোহন ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ ভক্ত-পরিকর এসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, শ্রীনিকেতনের শিল্পভবনে যে চারটি বিভাগ খোলা হয়েছিল সেগুলোর একটি মৃৎশিল্প বিভাগ। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার এক মাসের মাথায় লেখেন: "ফিরে চল মাটির টানে/ যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।" বস্তুত এ গানটি শ্রীনিকেতনের মর্মবাণী। ৬-৭ ফেব্রুয়ারিতে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠাকাল স্মরণ রেখে যে বার্ষিক উৎসব হতো সেখানে অন্যান্য সামগ্রীর সাথে কারুকার্যমণ্ডিত মাটির পাত্র কিংবা পুতুল ইত্যাদি দেশি-বিদেশির দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। এভাবেই গ্রামবাংলার অবহেলিত মৃৎশিল্প শহরের ধনীবাড়িতে শোভা পেতে লাগলো। ছিকায় নানারকম মাটির পাত্র, মাটির কলসি ঘরের একোণে-ওকোণে সাজিয়ে রাখাও তাঁর ও তাঁর আশ্রমের ছাত্রদের কারণেই প্রবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের বাসাবাড়িতে। নিজেও মাটির তৈরী সাজসজ্জা পছন্দ ও ব্যবহার করতেন। মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে বাঁশের পুষ্পাধার দেখে খুশি হয়ে বলেছিলেন: "শৌখীন দামী পাত্রে ফুলকেও যেন সাজাতে চায়–একটু বেশি রকম বাড়াবাড়ি সেটা। আমি তাই মাটির পাত্রে ফুল রাখতে চাই...।" (দেবী ১৯৭৯: ৩৮) মাটির তৈরী এসব সামগ্রীকে তিনি নাম দিয়েছিলেন "গণশিল্প" এবং লোকসংস্কৃতির এই বস্তুগত উপাদানের উন্নয়ন ভাবনা বস্তুত তাঁর স্বদেশিভাবনা বা স্বদেশিয়ানার অংশভূত ছিল।

মাটির ঘর

অন্ন ও বস্ত্রসামগ্রীর পর এবার বাসস্থান প্রসঙ্গে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথের কালে বাংলার আমজনতার অধিকাংশের বাসস্থান ছিল কাঁচা; খড়ে-ছাওয়া চাল, আর বেড়া হয় দরমা-চাটাইয়ের কিংবা মাটির। শেষোক্ত মাটির ঘরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতা ছিল অধিক। তার কারণ নানাবিধ। নিজের ৭০তম জন্মদিনে বলেছিলেন (*আত্মপরিচয়*): "যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।" (ঠাকুর ১৩৮১ক: ২০০) তাই নিজেই পরিকল্পনা করে মাটির বাড়ি বানিয়ে থাকতে শুরু করেছিলেন। পূর্ববাংলাতে থাকতেই তিনি মাটির ঘরের প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন। পদ্মা-গড়াইয়ে যে বজরায় থাকতেন তাঁর কক্ষের টেবিলেও মাটির ঘরের মডেল রাখতেন। বিশাল দালানে জন্ম নেওয়া, বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের অনেকটা সময় মাটির বাড়িতেই থেকেছেন। "কষ্ট হয় কিনা"—এমন প্রশ্নের জবাবে বলতেন: "...ভারতবর্ষের নিরানব্বইজন লোকই তো মাটির বাড়িতে থাকে, কষ্ট কি?" (দেবী

১৩৯৪: ১৪১) মাটির ঘর তাঁর চিত্ত ও চিন্তাকে এতোটাই আচ্ছন্ন করেছিল যে বিজ্ঞানের সাধারণ পাঠ দিতে গিয়েও মাটির ঘরের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। *বিশ্বপরিচয়*-এর "পরমাণুলোক" প্রবন্ধে পদার্থের পরমাণু কী তা বোঝাতে গিয়ে মাটির ঘরকে উদাহরণ করে এভাবে বুঝিয়েছেন:

> একটা মাটির ঘর নিয়ে যদি পরখ ক'রে বের করতে চাই তার গোড়াকার জিনিসটা কী, তাহলে পাওয়া যাবে ধুলোর কণা। যখন তাকে আর গুড়ো করা চলবে না তখন বলব এই অতি সূক্ষ্ম ধুলোই মাটির ঘরের আদিম মালমশলা। তেমনি করেই...বিশ্বের পদার্থগুলি ভাগ করতে করতে যখন এমন সূক্ষ্মে এসে ঠেকবে যে তাকে আর ভাগ করা যাবে না...আমাদের শাস্ত্রে তাকে বলে পরমাণু, য়ুরোপীয় শাস্ত্রে বলে অ্যাটম। (ঠাকুর ১৩৬৫: ৩৬১)

মাটির ঘর ছাত্রসকলের চেনাশোনার মধ্যে বলে মাটি ও ধূলির পার্থক্য দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। তবে ধূলি তো দেখা যায়, পরমাণু আরো ক্ষুদ্র, খালি চোখে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাই আরেকটু যোগ করে জানিয়েছেন যে, আমরা ধূলিকণাকে ভাঙতে না পারলেও বিজ্ঞানীরা আরও সূক্ষ্ম করে ভেঙে ভেঙে বিরানব্বইটা (তখন পর্যন্ত আবিষ্কারমতে) অমিশ্র মৌলিক পদার্থ শনাক্ত করেছেন। কিছুপরে মৌলিক আর যৌগিক পদার্থ বোঝাতে গিয়ে আবারও মাটির ঘরের কথাই তুলেছেন:

> মনে করা যাক, মাটির ঘরের এক অংশ তৈরী খাঁটি মাটি দিয়ে, আর-এক অংশ মাটিতে গোবর মিলিয়ে। তা দেয়াল গুঁড়িয়ে দুরকম জিনিস পাওয়া যাবে, এক বিশুদ্ধ ধুলোর কণা, আর-এক ধুলোর সঙ্গে মেশানো গোবরের গুঁড়ো। তেমনি বিশ্বের সব জিনিস পরখ ক'রে বিজ্ঞানীরা তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, এক ভাগের নাম মৌলিক, আর-এক ভাগের নাম যৌগিক। (ঠাকুর ১৩৬৫: ৩৬২)

শুধু নিজ দেশ নয়, বিদেশ ভ্রমণকালেও মাটির ঘর চোখে পড়লে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। কখনো সেই সূত্রে জগৎ-জীবন সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। যেমন, পারস্য পরিভ্রমণের সময় প্রচুর মাটির দেওয়াল ও দেওয়াল-ঘেরা বাড়িঘর দেখেছেন। ইরানের গ্রামাঞ্চলের মাটির বাড়িগুলো যথারীতি খুব একটা শক্ত ছিল না। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পথে-প্রান্তরে উটের কঙ্কাল আর মাটির বাড়ির ভগ্নাবশেষ বিশেষভাবে চোখে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের। *পারস্যে* নামাঙ্কনে ভ্রমণকাহিনীতে দেখা যাচ্ছে, এই ক্ষণভঙ্গুরতার কারণে বাড়িগুলোকে বলেছেন "যেন মাটির তাবু—উপস্থিত প্রয়োজনের ক্ষণিক তাগিদে খাড়া করা।" (ঠাকুর ১৩৭৮ক: ৪৮০) ভেবেছেন এ-ই বা মন্দ কী! মানুষ যদি উত্তরাধিকার সূত্রে একটা দেহ পেতো এবং সেটি খুব মজবুতও হতো, তবু নিশ্চয় তা পছন্দ করতো না; যেমন পূর্বপুরুষের ভিটা-ভিত অব্যবহারযোগ্য হওয়ার আগেই তা ছেড়ে যায় বা ভেঙে ফেলে দেয় সেই পরিবর্তনপ্রবণতার কারণেই। কিন্তু শান্তিনিকেতনের পাশের গ্রামগুলোতে সাধারণ মানুষের মাটির বাড়ির আরেকটু আয়ু বাড়ানোর প্রয়োজন বোধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ তাতে যে দরিদ্র গ্রামবাসীর নিজের জীবনটাই পার করা কঠিন ছিল। তাদের কাঁচা ঘর ঝড়ে-বৃষ্টিতে ফি বছর ভেঙে পড়তো। সেকারণেই কী করে তা আরও শক্তপোক্ত করা যায় তা নিয়ে ভেবেছেন। সেসব মাটির ঘরের আবার খড়ের চাল, সেগুলো প্রতি বর্ষার আগে নতুন

করে ছাইতে হতো। নইলে চাল ফুটো হলে তো বৃষ্টির পানিতে দেওয়াল আরো দ্রুত ভেঙে পড়তো, ভেজা-স্যাঁতসেঁতে মেঝের কারণে অসুখবিসুখ লেগেই থাকতো। তাছাড়া গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থা এতোটাই সঙ্গিন ছিল যে, চালে খড় দিতে গেলে গৃহপালিত পশুর প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগানো অসম্ভব হয়ে পড়তো। কাজেই ছাদটা কী করে শক্তপোক্ত করা যায় এবং পশুখাদ্যও নিশ্চিত করা যায় সেই ভাবনা থেকেই রথীন্দ্রনাথ মাটির ছাদের কথা ভেবেছিলেন। এজন্য একসময় রবীন্দ্রনাথ মাটির খোলা বা টালির উন্নয়ন ও প্রসারের চিন্তাও করেছিলেন। ১৯১৫ সালে পুত্র রবীন্দ্রনাথকে পতিসর থেকে পূর্বোক্ত চিঠিতে লিখেছিলেন:

> নগেন্দ্র বল্‌ছিল খোলা তৈরি করতে পারে এমন কুমোর এখানে আন্‌তে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাদ দিতে চায় পেরে ওঠে না—খোলা পেলে সুবিধা হয়। (ঠাকুর ২০১২: ৪৯)

তবে শান্তিনিকেতন বা বীরভূমের কাঁকরমিশ্রিত মাটি দিয়ে খোলা তৈরি করাও সহজ ছিল না। তাছাড়া কলকাতার মতো শহরেও তখন ধনীলোকদের বাড়িতে একদুটো টালির ছাদ দেওয়া ঘর থাকতো। আবার কিছুটা ভঙ্গুর হওয়ায় টালির ছাদের কিছু সমস্যাও ছিল। এসবের জন্যে রবীন্দ্রনাথ মাটির বেড়া দেওয়া বাড়িগুলোর জন্যে মাটির ছাদের কথাই ভাবছিলেন। ১৯৩২ সালে ইরানেই দেখতে পেয়েছিলেন বাড়ির ছাদও মাটির তৈরী; তাঁর বর্ণনা:

> আমরা গিয়ে বসলুম একটা মস্ত মাটির ঘরে। বেশ ঠাণ্ডা। মেঝেতে কার্পেট, এক প্রান্তে তক্তপোষের উপর গদি পাতা। ঘরের মাঝখান বেয়ে কাঠের থাম, তার উপরে ভর করে লম্বা লম্বা খুঁটির 'পরে মাটির ছাদ। (ঠাকুর ১৩৭৮ক: ৫০০)

শুধু শখের বশে বা জীবনের নশ্বরতার ভাবালুতা থেকেই যে তিনি মাটির ঘর নির্মাণে মনোযোগী হয়েছিলেন তা নয়। মূলত বাড়ি নির্মাণের এই ভাবনা ও কর্মোদ্যোগ বীরভূমের সার্বিক পরিবেশের কারণে। রুক্ষ এলাকা, কাঁচা ঘরবাড়ি প্রতিবছর অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার নিজেদের খাদ্যই জোটে না, গরু-মহিষকে কী খাওয়াবে? ঘরের চাল দিতে যেয়ে তো খড়কুটো শেষ হয়ে যায়। আবার টিনের চাল কিংবা বেড়া সেই মরুপ্রতিম এলাকায় বসবাসে কষ্ট বাড়িয়ে দেয়। এইসব মিলিয়ে মাটির ঘর নির্মাণই তাঁর কাছে অধিকতর গ্রহণীয় মনে হয়েছিল। আর চেয়েছিলেন:

> ...যেমন করেই হোক মাটির ছাদ টেকসই করে তুলতেই হবে। মাটিতে গোবর মেশালে, কাঁকর মেশালে, তুষ মেশালে—চাই কি আলকাতরাও মেশানো চলে; উই ধরবে না। এই-সব মেশানো মাটিতে ছাদ মজবুত হবেই। বালিমাটি বলে বড়ো ছাদে যদি ফাটবার ভয় থাকে ছোটো ছোটো ছাদ করলেই হবে। (চন্দ ১৩৯৪: ৯৫)

কথাটি তাঁর নিজের ঘর "শ্যামলী" বানানোর পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন। তার আগে লোকদের ধরে ধরে গ্রীষ্মকালে ঘর ঠাণ্ডা রাখার এক উপায় বাতলে দিতেন রবীন্দ্রনাথ, সে ভাবনাও ছিল মৃত্তিকাকেন্দ্রিক। বলতেন, ঘরের চারদিকে মাটির হাঁড়ি লাগিয়ে তার উপর চুনবালির পলেস্তরা দিয়ে দিতে। তাহলে দেয়ালের মাঝখানে হাওয়া থাকার জন্য

ঘরের ভিতর গরম হবে না। উৎসাহ দিয়ে বলতেন, কেউ একজন প্রথমে করে দেখালে, পরে অনেকেই করবে। রানী চন্দ জানিয়েছেন: "কিন্তু সেই 'প্রথম একজন' আর কাউকেই পাওয়া যায় নি এ যাবৎ। ...গুরুদেব নিজেই সেই 'প্রথম একজন' হলেন।" (চন্দ ১৩৯৪: ৯৫) "শ্যামলী"র উত্তর-পশ্চিমে একটি ঘর করা হয়েছিল মাটির হাঁড়ি দিয়ে। সারি সারি হাঁড়ির উপর হাঁড়ি সাজিয়ে দেয়াল তোলা হয়েছিল। ছাদের উপরও সারি বেঁধে মাটির হাঁড়ি উপুড় করে রাখা হতো। অবশ্য ছাদে বা বাইরে দেওয়ালের গায়ে মাটির কলস উল্টিয়ে রেখে ঘর ঠাণ্ডা রাখার একরকম প্রযুক্তি জোড়াসাঁকোতেও ছিল। রবীন্দ্রনাথ সেটিকেই আধুনিকায়ন করে জনপ্রিয় করতে চেয়েছিলেন।

মাটির ঘর নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পুরো চিন্তা, কর্ম ও আবেগের প্রতিফলন মেলে এই "শ্যামলী" বাড়িটির নানা ঘটনায়। ১৯৩৪-৩৫ সালে নির্মিত এই বাড়িটি নির্মাণ নিয়ে কবিতা লিখেছেন একাধিক। *বীথিকার* "সাঁওতাল মেয়ে" কবিতায় দেখা যাচ্ছে "শ্যামলী" নির্মাণের জন্য ঝুড়ি ভরে মাটি নিয়ে আসছে সাঁওতাল মেয়েরা। আর চিঠিপত্রে কিংবা অন্যদের স্মৃতিচারণে দেখা যাচ্ছে, আশপাশের গ্রাম থেকেও মানুষজন আগ্রহ ভরে বাড়িটির নির্মাণ কাজ দেখতে আসতো। মূলত, মাটির বাড়ি তো নতুন কিছু নয়, কিন্তু এবার তার ছাদও হবে মাটির—এই খবরেই কৌতূহল। রবীন্দ্রনাথও শিমুলতলায় বসে বাড়ি বানানো তদারকি করতেন আর উচ্ছ্বসিত হয়ে চিঠি লিখতেন অমিয় চক্রবর্তী, রানী চন্দ প্রমুখকে। অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠিতে (১১ ডিসেম্বর ১৯৩৪) লেখেন:

> এই আশ্রমে আমি কালে কালে নানান্ ঘরে বাস করে এসেছি—কোথাও বেশিদিন স্থায়ী হতে পারি নি। এবার কোণার্কের এই কোঠা থেকেও সরে যাবার চেষ্টায় আছি। মাটির ঘর তৈরি আরম্ভ হয়েছে। মর্ত্যলোকে ঐটেই আশা করচি আমার শেষ বাসা হবে। তারপরে লোকান্তর। এই মাটির ঘরটাকেই অপরূপ করে তোলবার জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা। ইঁট পাথরের অহঙ্কারকে লজ্জা দিতে হবে। (ঠাকুর ১৩৮১: ১২৭)

যদিও "মর্ত্যলোকে ঐটেই...শেষ বাসা" হয়নি রবীন্দ্রনাথের। তারপরেও নানা কারণে রবীন্দ্রনাথকে বাসাবদল করতে হয়েছে। কিন্তু ঐ যে আমরা আবেগের কথাও বলেছিলোম, তার প্রমাণ এই যে, বাড়িটি সহজে ছাড়তে চাননি রবীন্দ্রনাথ। একবার কদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি চলছিল। মাটির ছাদ ও দেয়ালে কিছুটা ক্ষতির চিহ্ন দেখা দিয়েছে। আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে অন্য বাড়িতে নেওয়া জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন। রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই রাজি হলেন না, বরং এক ঘোর বর্ষার রাতে সবাইকে অন্যত্র পাঠিয়ে একাই থেকে গেলেন। সে রাতে বৃষ্টিও হয়েছিল প্রচণ্ড। সারারাত দুশ্চিন্তায় থেকে ভোর না হতেই সবাই গুরুদেবের অবস্থা দেখতে এলেন। উৎকণ্ঠিত রানী চন্দদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের সহাস্য প্রতিবেদন: "কাল রাতে ছাদ চাপা পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এত বড়ো খবরটা খবরের কাগজে উঠতে উঠতে ফস্‌কে গেল—কি দুঃখের কথা বল্ দেখি!" (চন্দ ১৩৯৪: ৯৯) তাঁর বিশ্বাস ছিল "ছাদের জায়গায় ছাদ" থাকবে; তবে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে সন্তুষ্ট করতে পরদিন "উদয়ন"-এ থাকতে যান। আর

সেদিনই ছাদটা ধসে পড়েছিল। এবার "খবরটা খবরের কাগজে" উঠলো; কলকাতা *আনন্দবাজার পত্রিকার* ২৩ জুলাই ১৯৩৬ তারিখে সংবাদ শিরোনাম হলো: "রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী' অতিরিক্ত বারিপাতে ক্ষতিগ্রস্ত"—সংবাদে জানা গেল: "অতিরিক্ত বারিপাতের ফলে তাঁহার 'শ্যামলী' (মাটির ঘর) ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া তিনি তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে আছেন।" (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪: ৯)

তারপরও রবীন্দ্রনাথ শ্যামলীতে থেকেছেন। "বর্ষার শেষে ফিরে আবার ছাদ মেরামত করা হল। এবারে কেবলমাত্র মাটি নয়, মাটির উপরে তিরপল দিয়ে তার উপরে আবার মাটি আলকাতরা লাগানো হল।" (চন্দ ১৩৯৪: ৯৯) রবীন্দ্রনাথের এই মাটির বাড়ির খবর বেশ ছড়িয়েছিল। বহু লোক বিশেষ করে এই বাড়িটি দেখতেও আসতো, ছবি তুলতো। রবীন্দ্রনাথের দেখাদেখি অনেকেই শান্তিনিকেতনের অন্যান্য মাটির বাড়িতে থেকেছেন। অমিয় চক্রবর্তী আর তাঁর ডাচ স্ত্রী হৈমন্তী দেবী আল্পনা ও দেশীয় শিল্পে সাজানো মাটির বাড়িতে থেকেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রিয় "শ্যামলী" বাড়িতে মহাত্মা গান্ধীকে আতিথ্য দিয়েছেন। এমনকি তাঁর অবর্তমানে আসলে এখানেই যেন থাকেন এমন অনুরোধও করেছিলেন। সত্যি সত্যিই রবীন্দ্রনাথের লোকান্তরিত হওয়ার পর গান্ধীজি যে দুবার এসেছিলেন, সে দুবারই শ্যামলীতেই থেকেছেন।

শুধু মাটির বাড়ি তৈরী নয়, শান্তিনিকেতনে আরও অনেকভাবেই মাটির ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তৈজসপত্র, চারুশিল্পের কথা আগেই বলেছি। পথ-ঘাটের ক্ষেত্রেও সেখানকার মাটির কার্যগুণ ও সৌন্দর্যরূপকে অভিনবভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সৌন্দর্যসংস্থানের ক্ষেত্রে মাটির ক্ষয় বা তা থেকে সৃষ্ট লালচে-রুক্ষরূপকেই কাজে লাগানো হয়েছিল। বিষয়টি হলো, বীরভূমের "বীর" শব্দটিই এসেছিল বন অর্থে। তবে দীর্ঘদিন ধরে গাছকাটার ফলে মাটির ক্ষয় শুরু হয়, উপরের অংশে নরম মাটির পরিবর্তে নিচের পাথুরে বা কাঁকরকীর্ণ অংশ বেরিয়ে আসে যার মধ্যে লোহার পরিমাণ বেশি। আয়রন অক্সাইডের কারণে মাটি লাল দেখায়। এই কাঁকরমাটিরই স্থানীয় নাম মোরাম। "কবি যাকে বলেছেন 'গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ' তা ছিল মোরামঢালা পথ।" (চট্টোপাধ্যায় ২০০০: ১৯৫) রবীন্দ্রনাথ লালমাটির সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়েছিলেন, ভাস্কর্য নির্মাণেও তার কঠিন বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্থাপত্যভাবনায় এইসব স্বকীয়তার কারণে তা টেগোরিয়ানা (Tagoriana) বলে পরিচিতি পেয়েছিল। এ বিষয়ে বিশেষ পঠন-পাঠনের পরিপ্রেক্ষিতে একজন গবেষকের তথ্যনিষ্ঠ বক্তব্য:

> ঘর, বাড়ি, রাস্তা, ক্লাস নেওয়ার জায়গা, ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের গৃহনির্মাণে প্রায় সর্বত্রই স্থানীয় ল্যাটেরাইট বা লাল কাঁকর মাটিকে প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল। জল মিশিয়ে নিলে এই অঞ্চলের একেবারে উপরের স্তর ও তার অব্যবহিত নিচের স্তরের মাটি (Surface Soil এবং Sub Soil) যে-বিশেষ Structural বাঁধুনির সৃষ্টি করে, সেটাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগানো হয়েছিল। স্থানীয় মানুষের বহুকালের ভূমি-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, মাটির বাড়ি তৈরির প্রণালী

> এবং তাদের শৈলীকে যেমন ব্যবহার করা হয়েছিল, তেমনি উন্নতও করা হয়েছিল। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০০: ৪৬)

রবীন্দ্রনাথের মৃত্তিকাবিষয়ক এইসব কর্মযজ্ঞে নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর ও রামকিংকর বেইজের পরিকল্পনা-তত্ত্বাবধান ও আশ্রমের ছাত্রদের পরিশ্রম-কর্মনিবেদনের কথাও এখানে স্মরণ করতে হয়।

উপসংহার

আজকের বাস্তবতায় পুরোপুরি বা সেকালের মাটির মতো ঘর হয়তো উপযোগিতা হারিয়েছে, তবে মাটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাবস্তুর প্রাসঙ্গিকতা রয়ে গেছে। পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হলে কিংবা পৃথিবী যতোদিন মানুষের আবাসভূমি থাকবে ততোদিন মাটিকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো প্রীতিপূর্ণ ভাবনা ও কর্ম ধরে রাখা জরুরি।

শেষাংশে রবীন্দ্রনাথের *শেষ সপ্তক*-এর ৪৪ সংখ্যক কবিতার মর্মবাণীটি আবারও মনে করতে চাই; তিনি বলেছিলেন: "চিরদিন মাটি আমাকে ডেকেছে" (ঠাকুর ১৩৫১: ৯৮)—"শ্যামলী" বাড়িটি নির্মাণের প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত এই কবিতার শুরুটা করেছিলেন পদ্মাপারের মাটির ডাকের কথা দিয়ে। শেষে এসে বললেন: আজ আমি তোমার ডাকে/ ধরা দিয়েছি শেষবেলায়।" (ঠাকুর ১৩৫১ক: ৯৯) এটা কবির কল্পনাবিলাস নয়, আত্মজীবনবাণী। আমরা এই সময়ের একটি ঘটনা মনে করতে পারি। ১ জানুয়ারি ১৯৩৮ "কোণার্ক" বাড়ির পশ্চিম দিকের বাগানে হাঁটছিলেন—একা এবং দুর্বল শরীরে। হাতে ছিল না ছড়ি জাতীয় কিছু। এক জায়গায় "টাল খেতে খেতে কোনো রকমে সামলে উঠলেন।" দূর থেকে দ্রুত এগিয়ে এসে অভিমানে কিছুটা অনুযোগ করলেন রানী চন্দ; রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বললেন:

> আমি হলাম শ্যামলা ধরণীর বরপুত্র। শ্যামল মাটির সঙ্গেই আমার সম্পর্ক বেশি। সেখানেই আমার গভীর টান। আমার কি সাজে দালানে বাস করা। আমার এই মাটির বাসায় মাটি হয়ে থাকব, একদিন মাটির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাব—এই-ই ভালো। আগে থেকে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ করে নিই। (চন্দ ১৩৯০: ৩৭)

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ "জন্মদিনে" কাব্যের "১০" সংখ্যক কবিতায় যে বলেছিলেন "যে আছে মাটির কাছাকাছি,/ সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।" (ঠাকুর ১৩৬৫খ: ৭৮) সে কবি প্রকৃত অর্থে তিনি নিজেই। শিল্পী হিসেবে তিনি ছিলেন মৃত্তিকা-সংলগ্ন, আর একজন চিন্তক-বিজ্ঞানী তথা মনীষী হিসেবে সর্বার্থে ছিলেন মৃত্তিকামগ্ন। জগৎকে অনুপুঙ্খভাবে দর্শন করে, জীবনকে সূক্ষ্মভাবে অনুভব করে, মানবহিত সাধনায় নিজেকে নিবেদন করতে গিয়ে তিনি মাটিতেই অটল হয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র

চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর (২০০০)। *রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান*। আনন্দ পাবলিসার্স প্রা. লি., কলকাতা।

চন্দ, রাণী (১৩৯০)। *আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ*। বিশ্বভারতী।

চন্দ, রাণী (১৩৯৪)। *গুরুদেব*। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ (১৩৯৫)। *পিতৃস্মৃতি*। জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন্‌স্, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৫১ক)। *শেষ সপ্তক*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-১৮শ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৫১খ)। *সোনার তরী*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-৩য় খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৫৬)। *প্রভাতসঙ্গীত*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬০ক)। *কাহিনী*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-৭ম খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬০খ)। *পূরবী*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-১৪শ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৩)। *বীথিকা*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-১৯শ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৭)। *সমাজ*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-১২শ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৫ক)। *লিপিকা*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ২৬শ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৫খ)। *বিশ্বপরিচয়*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ২৫শ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৫খ)। *জন্মদিনে*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ২৫শ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৭০)। *বনবাণী*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ১৫শ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৭১)। *কণিকা*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ৬শ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৭৮ক)। *পারস্যে*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ২২শ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৭৮খ)। *ছড়ার ছবি*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-২১শ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৮১ক)। *আত্মপরিচয়*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-২৭শ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৮১ক)। *পল্লীপ্রকৃতি*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-২৭শ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৮১খ)। *চিঠিপত্র*-১১শ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৯১)। *বাংলা শব্দতত্ত্ব*। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৯৮)। *চিত্রবিচিত্র*। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪০১)। *গীতবিতান*-অখণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪১০)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-১৭শ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪১১)। *ছিন্নপত্রাবলী*। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪১৯)। *চিঠিপত্র*-২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৫৮)। *সাহিত্যের পথে*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-২৩শ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

দেবী, মৈত্রেয়ী (১৩৯৪)। কুটিরবাসী। *রবীন্দ্রনাথ : গৃহে ও বিশ্বে*। প্রাইমা পাবলিকেশন্‌স, কলকাতা।

দেবী, মৈত্রেয়ী (১৯৭৯)। *মংপুতে রবীন্দ্রনাথ*। প্রাইমা পাবলিকেশন্‌স।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অরণেন্দু (২০০০)। *শান্তিনিকেতন স্থাপত্য পরিবেশ এবং রবীন্দ্রনাথ*। বিশ্বভারতী।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অরণেন্দু (২০১২)। রবীন্দ্রনাথ ও গৃহস্থাপত্য এবং পরিবেশ। শ্যামল চক্রবর্তী ও সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *বিজ্ঞানভাবুক রবীন্দ্রনাথ*। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন (সম্পাদিত) (২০১৪)। *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ : আনন্দবাজার পত্রিকা* ৪। আনন্দ পাবলিসার্স প্রা. লি., কলকাতা।

হাজরা, প্রবালকান্তি (২০১২)। রবীন্দ্রনাথের কৃষি-ভাবনায় বিজ্ঞানের অধিকার। শ্যামল চক্রবর্তী ও সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *বিজ্ঞানভাবুক রবীন্দ্রনাথ*। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।